ঢাবির হলে ছাত্রলীগই ‘রাজা’

মেহেদী হাসান
৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১২:০০ এএম | আপডেট: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২২
০৮:৩৭ এএম

12
Shares

গ্রাফিক্স আমাদের সময়

advertisement

কাউকে পরোয়া করার সময় নেই। নিজেদের রাজ্যে ছাত্রলীগ একাই রাজা। আবাসিক হলে শিক্ষার্থীদের সিট বরাদ্দ দেয় ছাত্রলীগ। পছন্দ না হলে সিট থেকে নামিয়ে দেওয়ার কাজটাও সারেন ক্ষমতাসীন দলের এই ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের ১৩ আবাসিক হলের প্রশাসনিক ক্ষমতা হল প্রাধ্যক্ষদের হাতে থাকলেও ছাত্রলীগই সেখানকার ছায়া প্রশাসন। অধিকাংশ হলে প্রাধ্যক্ষ পুতুল ভূমিকায়। ছাত্রলীগের এসব ধারাবাহিক অপকর্ম নীরবে মেনে চলেছেন তারা। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মেয়েদের হলগুলো। মেয়েদের ৫টি হলের কিছু কক্ষ ছাড়া সবগুলোয় হল প্রশাসন বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এটি শুধু আওয়ামী লীগ সরকারের টানা তিন মেয়াদের চিত্র নয়, বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময়ও ঘটত একই ঘটনা।

advertisement

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭ হাজারের মতো। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ২১ হাজার, ছাত্রীসংখ্যা ১৬ হাজারের কিছু বেশি। ছাত্রদের জন্য ১৩টি হল ও ২টি হোস্টেলে আসন আছে ১১ হাজারের কিছু বেশি। অর্থাৎ ৪৮ শতাংশ ছাত্রের আবাসনের ব্যবস্থা নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জেলা, উপজেলা ও গ্রাম থেকে আসা বহু সীমিত আয়ের পরিবারের সন্তানরা ভর্তি হন। তাদের পক্ষে ঢাকায় বাসা ভাড়া করে সন্তানের পড়াশোনা করানো কঠিন। আবাসন-সংকটের কারণে সাধারণত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের বৈধ আসন পাওয়ার সুযোগ নেই। নানা কারণে প্রথম বর্ষের যেসব শিক্ষার্থী হলে থাকতে বাধ্য হন, তাদেরও হলে উঠতে হয় ছাত্রলীগ-নিয়ন্ত্রিত কোনো একটি হলের গণরুমে। এর মধ্যে কোনো কোনো গণরুমে এক কক্ষে ৩০-৪০ শিক্ষার্থীও থাকেন। গণরুমে থাকতে হলে শিক্ষার্থীদের নিয়মিতভাবে ছাত্রলীগের মিছিল-সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে যেতে হয়। একই সঙ্গে হলের গেস্টরুমে (অতিথিকক্ষ) ছাত্রলীগ নেতাদের ‘আদব শিক্ষার ক্লাসে’ বাধ্যতামূলকভাবে অংশ নিতে হয়। প্রথম বর্ষে গণরুমে রাখা থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের ধাপে ধাপে বিভিন্ন কক্ষে স্থানান্তর করেন ছাত্রলীগের নেতারাই।

আবার বিভিন্ন হলের কক্ষ দখল ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রায়ই ছাত্রলীগের বিভিন্ন পক্ষ সংঘাতে জড়ালেও এসব ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থাও নিতে পারে না। গত সাড়ে ছয় মাসে কক্ষদখল নিয়ে অন্তত ছয়বার সংঘাতে জড়িয়েছে স্যার এএফ রহমান হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও মাস্টারদা সূর্য সেন হল শাখা ছাত্রলীগের দুই পক্ষ। হল বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এসব ঘটনায় কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

আবার প্রত্যেক হলেই রয়েছে গেস্টরুম কালচার। ছাত্রলীগের ‘অবাধ্য’ হলেই প্রথম বর্ষের ছাত্রদের ওপর নেমে আসে নির্যাতন। ‘অবাধ্য’ শিক্ষার্থীদের বিচারে নিয়মিত হলগুলোর অভ্যর্থনাকক্ষে বসে ছাত্রলীগের আদালত। ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে এটি ‘গেস্টরুম কালচার’ নামে পরিচিত। শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে থাকার ‘আদব-কায়দা’ শেখানোর নামে মানসিক নির্যাতন করা হয় ‘গেস্টরুমে’। কখনো কখনো করা হয় শারীরিক নির্যাতনও। এ ছাড়া কর্মসূচিতে অংশ না নিলেও ‘বিচারের’ মুখোমুখি হতে হয়। কখনো কখনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে না গেলে হল থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। সিট পেতে হলে বাধ্যতামূলক ছাত্রলীগের কথা মতো চলতে হয়। যারা নিয়মিত ছাত্রলীগের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে তাদের আগে সিট দেওয়া হয়। সিট পাওয়ার জন্য ছাত্রলীগের নেতাদের কাছেই যেতে হয়। প্রশাসন হলে সিট দেওয়ার ক্ষেত্রে নীরব ভূমিকা পালন করে।

গত সোমবার রাতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলের মূল ভবনের সামনে একদল শিক্ষার্থী ‘এক দফা এক দাবি, সিট চাই সিট চাই’, ‘মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, সিট আমার অধিকার’ বলে স্লোগান দিচ্ছিলেন। হলের মূল ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান দেওয়ার কারণ, সেই ভবনে বাস করেন ছাত্রলীগের হল শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। শিক্ষার্থীরা হলের প্রাধ্যক্ষ বা প্রভোস্টের বাসভবনের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো স্লোগান দেননি। আবাসিক শিক্ষকদের বাসভবনের সামনেও তারা যাননি। কেন তারা হল ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উদ্দেশে দাবি তুলে ধরলেন, তা জানতে চাইলে শিক্ষার্থীরা বলেন, হলটির তিনটি ভবনের ৩০৫টি কক্ষে ১ হাজার ২৮৮টি আসন আছে। এসব আসনের প্রায় সবই ছাত্রলীগের দুই নেতার নিয়ন্ত্রণে। তাই ছাত্রলীগ নেতাদের কাছেই দাবি জানিয়েছেন। এত দিন তারা ‘গণরুম’-এ থেকে নিয়মিত ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন। এর বিনিময়ে গণরুম থেকে তাদের ‘ভালো’ রুমে নেওয়ার কথা।

এক শিক্ষার্থী বলেন, আগে বিভিন্ন ছবিতে দেখতাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে সিট বরাদ্দ দিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু বাস্তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে দেখলাম সম্পূর্ণ উল্টো ঘটনা। এখানে রুম পেতে হলে নিয়মিত গেস্টরুম প্রোগ্রাম করা লাগে। এগুলো করেও সিট পাচ্ছি না। বড় ভাইয়েরা (ছাত্রলীগের নেতারা) মনে করেন সিট পেলে আর আগের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পাবেন না। তাই তাদের স্বার্থে আমাদের ব্যবহারের জন্য সিট দিচ্ছেন না। হল প্রশাসনের কাছে বলেও কোনো লাভ হয় না। কারণ তারা কিছুই করতে পারে না। বড় ভাইরা যে রুমে আমাদের সিট দেন হল অফিস থেকে তারা শুধু সেই রুম আমাদের নামে দিয়ে একটা হল কার্ড করে দেন।

অন্যদিকে তীব্র আবাসন সংকটের মধ্যেও আবার দেখা যায় ছাত্রলীগের নেতারা হলগুলোতে বিলাসী জীবনযাপন করেন। আর আবাসন সংকটের কারণে হলের ছোট্ট কক্ষে গাদাগাদি করে কোনোরকমে দিনযাপন করেন শিক্ষার্থীরা। কেউ আবার শোবার জায়গাটুকুও না পেয়ে ঘুমান মসজিদের ফ্লোরে, রিডিংরুমের চেয়ারে এবং হলের ছাদে; কিন্তু প্রতিটি হলের ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতা রাজকীয় জীবনযাপন করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ৪ জন অথবা ২ জনের জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষে একাই থাকেন তাদের কেউ কেউ। কারও কারও কক্ষে রয়েছে খাট, ফ্রিজ, টিভি।

হলের কক্ষ দখল ও নিয়ন্ত্রণের অভিযোগের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন বলেন, হলের কক্ষ দখল বা নিয়ন্ত্রণ এ গুলো রাজনৈতিক টার্ম। যে কোনো ঘটনা রাজনৈতিক রঙ দেওয়ার জন্য এবং ছাত্রলীগকে ঘায়েল করার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়। ছাত্রসংগঠন হিসেবে আমরা শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বিদ্যমান বাস্তবতায় সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা নিয়ে যেন তারা লেখাপড়া করতে পারে, সেটি নিশ্চিত করার চেষ্টা করি। তিনি বলেন, আবাসিক হলে কারও থাকা না-থাকা, কে কোথায় থাকবে না থাকবে, তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিষয়। যেসব শিক্ষার্থীর থাকার বিকল্প ব্যবস্থা থাকে না, তাদের জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানাই, দাবি করি এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাদের সহযোগিতা দেওয়ার চেষ্টা করি। এটি আমরা কোনো রাজনৈতিক বা সাংগঠনিকভাবে সুবিধা নেওয়ার জন্য করি না। নবীন শিক্ষার্থীদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেওয়ার জন্য এটি করা হয়।

রাজনৈতিক বিবেচনায় হল প্রশাসন হলগুলোয় প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। ফলে প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকেরা ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের প্রতি 'দুর্বল' থেকে তাদের হল নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দেন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন আলোচনা আছে, প্রাধ্যক্ষরা শুধু শিক্ষার্থীদের কাগজপত্র স্বাক্ষর করেই দায়িত্ব শেষ করেন। হলের শৃঙ্খলা, মেধার ভিত্তিতে আসন বণ্টন, ক্যান্টিনের খাবারের মান ইত্যাদি নিয়ে তাদের তেমন মাথাব্যথা নেই। আবাসিক শিক্ষকেরাও নিজেদের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'ব্লকে' যান না। এ কারণে বেশির ভাগ আবাসিক শিক্ষার্থীই নিজের ব্লকের আবাসিক শিক্ষককে চেনেন না। ১৮টি হলের ১৮ জন প্রভোস্টই আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন 'নীল দলের' রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। একইভাবে আবাসিক শিক্ষকদের প্রায় ৯৯ শতাংশই সরাসরি নীল দলের রাজনীতি করেন।

সার্বিক বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামান বলেন, আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, আর এই সীমাবদ্ধতার জন্যই নানা রকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। তবে হলগুলো প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণেই আছে। ঐতিহ্যগতভাবেই প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের

আবাসিক হলগুলো চলছে। প্রতিটি হলেই একটি প্রশাসন রয়েছে। সেই প্রশাসনে থাকা প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষকেরা তাদের কাজ করছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান আমাদের সময়কে বলেন, আবাসিক হলগুলোয় আসন বণ্টন বা সার্বিক ব্যবস্থাপনার খুব কম ক্ষেত্রেই প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণ আছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের হাতে। সাধারণত রাজনৈতিক পরিচয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বিবেচনায় প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। এর ফলে ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের অনাচারের বিরোধিতা করা বা শিক্ষার্থীদের স্বার্থ দেখার মতো ব্যক্তিত্ববান শিক্ষকেরা প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার বিবেচনায় থাকেন না।